SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

দার্শনিকগণের দৃষ্টিকোণে মানব ও পরিবেশ

Satyen Shit
Research Scholar, Dept. of Sanskrit
Vidyasagar University, Midnapore,
Paschim Medinipur, West Bengal, India
Email: satyenshit22@gmail.com

Abstract: দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ককে এই শোপপ্রবন্ধে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে আলোচিত হয়েছে যে, দর্শন শুধু একটি তাত্ত্বিক শাস্ত্র নয়, বরং এটি জীবন ও জগতের মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজে। পাশ্চাত্য দর্শন, যেমন থেলস থেকে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত, প্রকৃতি ও মানুষকে বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে, ভারতীয় দর্শন আরও গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করেছে।

চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি (যেমন, দেহাত্মবাদ, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পঞ্চমহাব্রত) ব্যবহার করে প্রতিপাদন করা হয়েছে কিভাবে এই প্রতিটি দর্শন মানুষকে নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির পথ দেখায়। শোধপ্রবন্ধের মূল বক্তব্য হলো, মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়ন পরিবেশের সুস্থতার জন্য অপরিহার্য। তাই বলা যায় যে, মানুষ এবং পরিবেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য; একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মানুষের দায়িত্ব হলো এই ভারসাম্য রক্ষা করা।

Keywords: দর্শন ও পরিবেশ, ভারতীয় দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন, মানবতাবাদ, পরিবেশনীতি।

ভূমিকা—

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ বাতাস তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য করে।"[১]

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীর আশ্রয়স্থল হল এই পরিবেশ আর তার আশ্রয়ে আশ্রিত বিশিষ্ট প্রানী হল মানব এবং তাদের বাঁচার তাগিদ হল এই দর্শন। কারণ দর্শনই পারে প্রত্যেক প্রাণীকে আলাদা আলাদা করে যুক্তিপূর্ণ বাক্যে চিহ্নিত-করণের দর্পন করতে। তাই দর্শন ব্যতীত মানব বেঁচে থেকেও মৃতের সমান। আত্মাকে জানাই হল ভারতীয় দর্শনের মূলকথা। সুতরাং এই আত্মাশ্রিত জীবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান প্রানী হল মানব। কারণ মানবই পারে একমাত্র এই আত্মাকে জানতে। তাই তো দর্শন হল এক পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষণ, যা আত্মার চৈতন্যে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সত্যের স্বরূপ উপলব্ধিই দর্শন। অতএব বলা যেতে পারা যায় যে— দর্শন একাধারে আলোচনা শাস্ত্র ও জীবন দর্শন, দুই- ই।

দর্শনের ব্যুৎপত্তি—

দর্শন শব্দটি ইংরেজী Philosophy শব্দ থেকে এসেছে। ফিলোসফি শব্দটি এসেছে প্রাচীন গ্রিক ভাষা থেকে। গ্রিক ভাষায় ফিলোসোফিয়া শব্দটি দুটি শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ

করেছে। শব্দ দুটি হল— ফিলোস অর্থাৎ বন্ধু বা ভালোবাসার পাত্র এবং সোফিয়া অর্থাৎ প্রজ্ঞা। এরথেকেই স্পষ্টতই বোঝা যায়, দর্শনের সাথে মূল সম্পর্ক হচ্ছে প্রজ্ঞার। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এটি হল প্রজ্ঞার ভালোবাসার। জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা এক জিনিস নয়। ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ও নির্ভুল ধারণা থেকে জ্ঞান লাভ করা যায়। দর্শনের প্রধান কাম্য বিষয় হল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার অনুসন্ধান চর্চার মাধ্যমেই দর্শন বিকাশ লাভ করে।

এছাড়া সংস্কৃতে 'দর্শন'— শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল দৃশ-ধাতু+অনট = দর্শনম্ অথবা দৃশ্যতে অনেন ইতি দর্শনম্, যার সাধারণ অর্থ হল দেখা। এই দেখা ভিন্নরকমের হতে পারে। যেমন— ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ, ধারণালব্ধ জ্ঞান বা কোন অভিজ্ঞতা ও দেখা শব্দের অর্থ হতে পারে। আবার দেখা মানে ঘটনার পর্যবেক্ষণ, আত্মার পরিজ্ঞানও হতে পারে। কিন্তু দর্শন বলতে উপলব্ধ-সত্যের বিচারমূলক অন্তর্নিরীক্ষণ বা সত্যের সাক্ষাৎকার। কিন্তু সাধারণ দেখা আর দর্শন এক নয়। দর্শন শব্দের অর্থ হল দৃষ্টি। যে শাস্ত্রের অধ্যয়নে যথার্থ জ্ঞান দৃষ্টিগোচর হয়, তাই হল দর্শনশাস্ত্র। অতএব তত্ত্বদর্শনের উপায় শাস্ত্রই হল দর্শনশাস্ত্র।

মানব ও পরিবেশে দর্শনের ভূমিকা—

আদিকালে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি খুব অধিক ছিল না। তাই দর্শনই হল আদি জ্ঞানের মূল ভান্ডার। দর্শন হল অস্তিত্ব, জ্ঞান, মূল্যবোধ, কারণ, মন এবং ভাষা সম্পর্কে সাধারণ এবং মৌলিক প্রশ্নগুলির অধ্যয়নের সোপান। জগৎ, জীবন, মানুষের সমাজ, তার চেতনা এবং জ্ঞানের প্রক্রিয়া প্রভৃতির মৌল বিধানের আলোচনাকে ও দর্শন বলা হয়। প্রাচীনকালে মানুষ তার নিজের উদ্ভব মুহূর্ত থেকেই চিন্তার এরূপ ক্ষমতা দেখাতে সক্ষম ছিল না, দর্শনের প্রভাবে মানুষের চেতনার বিকাশের একটা স্তরে মানুষ ও তার পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করে। নিজের জীবনকে অধিকতর নিশ্চিত করে রক্ষা করার প্রয়োজনে মানুষ প্রকৃতি জগতের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে। প্রকৃতি, জগৎ এবং পরবর্তীকালে মানুষের নিজের দেহ এবং চেতনা সম্পর্কেও সে চিন্তা করতে শুরু করে। কার্ল মার্কস এবং ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস দর্শনকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে বলেন যে, দর্শন হবে জীবন এবং জগৎকে বৈজ্ঞানিক এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। দর্শন হবে বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের স্বার্থে জগৎ এবং সমাজকে পরিবর্তিত করার ভাবগত হাতিয়ার। দর্শন কোনো অবাস্তব কল্পনা নয়। দর্শন জগৎ ও জীবনের মৌলিক বিধানের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

পরিবেশ দর্শনের মধ্যে পরিবেশ নীতিশাস্ত্র, পরিবেশ নন্দনতত্ত্ব, পরিবেশ নারীবাদ ইত্যাদির বিচরণ লক্ষ্য করা যায়, পরিবেশে স্থিত শব্দদূষণ, জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মৃত্তিকা দূষণ ইত্যাদির প্রভাবের কারণ ও সমস্যার সমাধানের পক্ষ খুঁজে দর্শনের যুক্তি দ্বারাই সার্বিক পরিবেশের উন্নতি সাধন করা, যাতে পরিবেশ ও প্রাণীকুল সুরক্ষিত থাকে। কারণ, পরিবেশ ও প্রাণীকুল হল তাদাত্ম্য অর্থাৎ একে পররের অন্বয়মুখী। তাই তো এই অন্বয়ের লক্ষ্যন হল— "তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বান্বয়ঃ" আবার "তদাভাবে তদাভাবো ব্যতিরেকঃ" অর্থাৎ যেটা ছাড়া যেটা থাকতে পারে না, অর্থাৎ পরিবেশ ব্যতীত প্রানীকুল নিরাশ্রিত।

মানবতাবাদ—

"মানবতাবাদ"— শব্দটি বহু অর্থদ্যোতক, ১৮০৬ সালের দিকে "হিউম্যানিসমাস"-

শব্দটি জার্মান বিদ্যালয়গুলোতে গঠিত ধ্রুপদী পাঠ্যসূচীকে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হত ১৮৩৬ সালের দিকে "হিউম্যানিজম" বা মানবতাবাদ এই অর্থে ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার করা শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে "মানবপ্রেম একটি মহৎ গুণ যার জন্য এখন ও কোন নাম আবিষ্কৃত হয়নি এবং যাকে আমরা "মানবতা" বলে অভিহিত করব, কারণ এই মহৎ গুনের নামকরণ করার সময় হয়েছে।" ঊনবংশ শতকে মানবতাবাদ বলতে বিভিন্ন জনসেবামূলক সংগঠন এবং নিজেদেরকে মানবসেবা ও জ্ঞানের প্রসারের কাজে নিয়োজিত করা হয়। অতএব বলা যায়, মানবতাবাদ কেবল মানবের জন্য নয়, এটি পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পরিবেশ দর্শন—

পরিবেশ হচ্ছে দর্শনের একটি শাখা যা প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেখানে মানুষের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করে। এটি মানুষের সাথে পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যেমন "যখন আমরা প্রকৃতি নিয়ে কথা বলি তখন কী বুঝিয়ে থাকি?" "যা আমাদের কাছে অমানব পরিবেশ তার মূল্য কী?" কিভাবে আমরা প্রাকৃতিক জগৎ এবং মানব প্রযুক্তি ও উন্নয়নের মধ্যকার সম্পর্ক বুঝতে পারব? এবং "এই প্রাকৃতিক জগতে আমাদের স্থান কী?" ইত্যাদির প্রভাবে পরিবেশ দার্শনিকদের প্রধান আগ্রহের বিষয়গুলি হল—

(ক) পরিবেশ ও প্রাকৃতিকে সংজ্ঞায়িত করা।
(খ) বিপদশঙ্কুল প্রজাতির চিহ্নিতকরণ।
(গ) কীভাবে পরিবেশকে মূল্যায়ন করা যায়।
(ঘ) প্রানী এবং উদ্ভিদের নৈতিক মর্যাদা।
(ঙ) প্রকৃতির পুণঃ প্রতিষ্ঠা।
(চ) ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিবেচনা।

সুতরাং বলা যায় যে, পরিবেশ দর্শনে কেবলমাত্র পরিবেশ সম্পর্কিত হয় না। তার সঙ্গে আলোচিত হয় সমস্ত প্রানীকুল, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রানী হল মানব। যারা পরিবেশকে রক্ষা করতে পারে। আবার ধ্বংস ও করতে পারে। অতএব বোঝা যাচ্ছে মানবই পরিবেশের মেরুদন্ড। যার ব্যতীত পরিবেশ সুরক্ষিত নয়।

পাশ্চাত্যদার্শনিকগনের দৃষ্টিতে মানুষ ও পরিবেশ—

দর্শন সাহিত্যের আবিষ্কার হয় সুদূর প্রাচীনযুগ থেকে তথা গ্রীক যুগ থেকে, যা আজও পরিবেশের মানুষের মধ্যে বিচরণশীল হয়ে আছে। এই দর্শন নিয়ে প্রথম আলোচনা করে দার্শনিক থেলস্। তাই দার্শনিক থেলস্ কে বলা হয় দর্শনের আদিজনক। পাশ্চাত্যদার্শনিকগণের নামগুলি হল— সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখগণ। আমরা এখন দেখব পাশ্চাত্য দার্শনিকদের দর্শন চিন্তায় মানুষ ও পরিবেশ কতটা প্রভাবিত হয়েছে। পাশ্চাত্যদার্শনিকরা প্রথম এই জগৎ তথা পরিবেশ উৎপত্তির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এঁরা ছিলেন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক। এঁরা একটি তত্ত্বের সাহায্যে জগৎকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আর এঁরা মূলতঃ ছিলেন প্রকৃতিবাদী, কারণ এঁরা প্রকৃতির তত্ত্বগুলিকে অর্থাৎ প্রকৃতির আদি কারণেতে সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। এঁরা

রহস্যতত্ত্বকে উন্মোচন করার চেষ্টা করেন। আরও কিছু কিছু পাশ্চাত্য দার্শনিকরা ছিলেন মানবতাবাদী, এঁরা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনকে গুরুত্ব দেননি, দিয়েছেন কেবল মানুষকে। তাই তাঁদের মূল আলোচ্য কেন্দ্র ছিল মানুষ।

সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ মানুষ ও পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের রহস্যকে উন্মোচনে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁরা কেবল পরিবেশ বা মানুষকে গুরুত্ব দেন নি, দিয়েছেন দুটোকে। কারণ পরিবেশ তখনই পরিবেশ হয় যার মধ্যে প্রানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তাই আমাদের প্রত্যেককে পরিবেশ রক্ষার ভার নিতে হবে, সুস্বাস্থ্য পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য।

ভারতীয় দার্শনিকগনের দৃষ্টিতে মানব ও পরিবেশ—

জাগতিক রহস্যে ভারতীয় দার্শনিকগণ ছিলেন পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে মানুষ অস্তিত্বের সংগ্রামে অধিক সময় ব্যস্ত থাকার আধ্যাত্মচিন্তায় অধিক মনোযোগ দিতে পারে নি। কিন্তু ভারত সে দিক থেকে অনেকটা আগ্রগামী ছিলেন এবং আছেনও। তাই ভারতের বুকে— "প্রথম প্রভাত তবগগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে"— দেখা দিয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত দর্শন চর্চার রূপ নেয়। তাই তো এই দেশের অগ্রজন্মা ঋষিদের নিকট থেকে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করেছিল। তাইতো মনুসংহিতায় উক্ত আছে—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষোরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥"[২]

এমনকি দেবতারা পর্যন্ত এই পূণ্যকর্মময় ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণের জন্য লালায়িত ছিলেন।

তাই তো বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু তে ভারত ভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে॥"[৩]

ভারতীয় দর্শন কেবল তাত্ত্বিক নয় এর একটি প্রয়োগের দিকও আছে। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। দার্শনিক জ্ঞান জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে এবং যথাযথ জীবনযাপনে সাহায্য করে। তাই ভারতীয় দর্শন হল— আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধি।

ভারতীয় দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সংশ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। পাশ্চাত্য দর্শনের মত ভারতীয় দর্শন ও অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, মনোবিদ্যা এবং জ্ঞানবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করে। তবে পাশ্চাত্য দর্শনের মতে এগুলোর পৃথক পৃথক আলোচনা না করে সামগ্রিক আলোচনা ভারতীয় দর্শনে দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনে মোক্ষই পরমার্থ।

আমাদের এই ভারতীয়দর্শন অন্যান্য দর্শনের চেয়ে আলাদা। কারণ— প্রত্যেক ভারতীয় দার্শনিকই প্রতিপক্ষের বক্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন পরে তা যুক্তিসম্মত উপায়ে খন্ডন বা নিরস্ত করে নিজমত প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে প্রতিপক্ষ, খন্ডন ও সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ভারতীয় দর্শনের বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ভারতীয়দর্শনই এভাবে পারস্পরিক আলোচনা ও বিচারের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমাদের এই ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি হল—

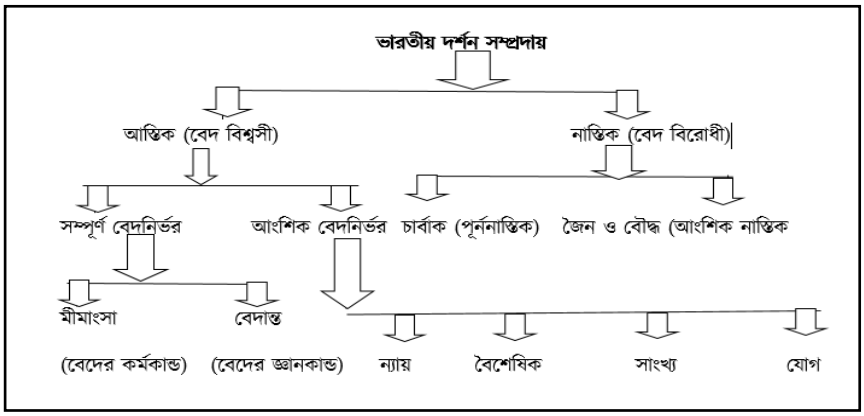

এখন আমার আলোচনা করব ভারতীয় দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে প্রত্যেক দর্শন সম্প্রদায় মানব ও পরিবেশে কতটা প্রভাব ফেলেছে—

চার্বাক দার্শনিকগণের দৃষ্টিতে মানব ও পরিবেশ—

চার্বাক দর্শনের আর এক নাম হল লোকায়ত দর্শন। কারণ এই দর্শনের দার্শনিকরা হলেন বেদ বিরোধী অর্থাৎ নাস্তিক ও জড়বাদী। এদের মতে ইহলোকই একমাত্র অস্তিত্বশীল, পরলোক বলে কিছু নেই। এই দর্শন লোক মুখে প্রবাহিত থাকায় চার্বাক দর্শনকে লোকায়ত দর্শন বলা হয়। 'চার্বাক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে 'চারুঃ বাক্ যস্য সঃ চার্বাকঃ' অর্থাৎ যিনি সুন্দর সুন্দর মনোহারী কথা বলে আমাদের আকৃষ্ট করেন তিনিই হলেন চার্বাক। এখন আমরা দেখব চার্বাক দর্শনের কোন কোন তত্ত্বগুলি মানব ও পরিবেশে প্রভাব ফেলেছে—

(i) দেহাত্মবাদ—

চার্বাক দার্শনিকরা ছিলেন দেহাত্মাবাদী। তাঁদের মতে দেহ অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই। তাই দেহ অতিরিক্ত আত্মা না থাকায় চার্বাকেরা পুর্ণজন্ম বা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে ইহলোকই সবকিছু, পরলোক বলে কিছু নেই। স্বর্গ, নরক হল ইহলোকের সুখ ও দুঃখ। তাই চার্বাকেরা বলেন—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥"[৪]

অর্থাৎ, যতদিন বাঁচবে, সুখেই বাঁচার চেষ্টা করবে, কারণ মৃত্যুকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। মৃত্যুই অপবর্গ বা মোক্ষ। মৃত্যু অমঙ্গলদায়ক নয়, মৃতের পক্ষেও নয়, জীবতের পক্ষেও নয়। মৃতের কোন অনুভূতি থাকে না, আর জীবিতের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হয় না। তাই মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে বুদ্ধিমানের মত জীবনকে পরিপূর্ন ভাবে জীবনকে উপভোগ কর- খাও, দাও, ফুর্তিতে থাক।

অতএব আমরা দেখি যে, চার্বাকরা বেদ বিরোধী হলেও তারা যে এই জগৎ সংসারে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়, তা আমরা দেখতে পাই চার্বাকদের এই নীতি বাক্যের মাধ্যমে। কারণ তারাও মনে করেন- ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই আর এই মৃত্যুকে কেউই এড়াতে পারে না। কারণ মৃত্যু হল এক পরম সত্য। তাইতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"[৫]

তাই তো আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ দেহরূপ মায়াকে ত্যাগ করে যথাসাধ্য সুখে বাস করা কারণ এর দ্বারাই মানব ও পরিবেশের বন্ধন অটুট থাকে।

ii) পিতামাতাই দেহ সৃষ্টির কারণ—

জড়বাদী এই চার্বাক দার্শনিকরা মনে করেন যে যদিও ভূতচতুষ্টয়ের কোনটিতে চৈতন্য থাকে না তথাপি ভূতচতুষ্টয়ের নির্দিষ্ট আকারে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজানোর ফলে জীবনীশক্তি বা চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে। পরমানু সমূহের এই বিশিষ্ট বিন্যাসের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণ হলো পিতামাতার মিলনে দেহ সৃষ্টি। তাই চার্বকরা মহাপ্রলয় মানে না তাই আদি প্রাণশক্তি বা চৈতন্যের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে অথবা আদি পিতা মাতার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, এসব প্রশ্ন চার্বাকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

আমরা দেখলাম যে চার্বাকরা দেহ সৃষ্টির মূলকারণ এই পিতা ও মাতাকে বুঝিয়েছেন। সত্যিই আমরা অন্ধকারে নিমজ্জমান কারণ আদি প্রাণশক্তির উদ্ভব আমরা জানি না। তাই আমাদের প্রত্যেককে মেনে নিতে হবে পিতামাতাই দেহ সৃষ্টির কারিগর। তাই আমাদের সকলকে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা করা উচিৎ। কারণ আমরা যে এই জগৎ কে দেখতে পাচ্ছি সোটা তাঁদের সৃষ্টির কারণে। তাইতো মহাভারতের বনপর্বে পিতামাতার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—

"মাতা গুরূতরা ভূমেঃ খ্যাত্ পিতোচ্চতরস্তথা"।[৬]

অতএব মানবকুল যে বেঁচে আছে প্রত্যেক পিতামাতার সৃষ্টির কারণে। তাই আমার মনে হয় পিতামাতার প্রতি সকলের শ্রদ্ধাপূর্ণভাব পোষন হলেই পরিবেশ ও মানবের মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ বন্ধন টিকে থাকবে।

বৌদ্ধদার্শনিকগনের দৃষ্টিতে মানব ও পরিবেশ—

বৌদ্ধদর্শন ঈশ্বর ও বেদবিশ্বাসী নয় বলে "নাস্তিক"-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। এই বৌদ্ধদার্শনিকরা কেবলমাত্র নিজের মুক্তির উপায়ে সন্তুষ্ট না হয়ে জনসাধারণের মুক্তি ও দুঃখ দূর করার জন্য তাঁর উপলব্ধি বা জ্ঞানের প্রচার করেছিলেন। সেগুলি হল-

চত্বারি আর্য সত্যানি—

বৌদ্ধদার্শনিকদের ধর্মাবলম্বী গ্রন্থ হল ত্রিপিটক। যেখানে এই চত্বারি আর্য সত্যের কথা বলা হয়েছে যা আমাদের অর্থাৎ মানব সমাজকে এক সঞ্জীবনি মন্ত্রের মতো জীবন দান করে এবং যা পরিবেশের সুস্বাস্থ্যের সমান। সেই চত্বারি আর্যসত্যগুলি হল—

১) দুঃখ আছে—

এই সংসার দুঃখময়। জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, ক্লেশ, আকাঙ্খা ইত্যাদি যাবতীয় আসক্তির বিষয় দুঃখময় হয়। বস্তুমাত্রই ক্ষণিক, তবে দুঃখসৃষ্টিকারী। মানুষের কামনায় বাসনায় এই দুঃখ উৎপন্ন করে। তাই মহামুনি মনু তাঁর মনুসংহিতায় বলেছেন—

"ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্যাত্যব্যসনী মৃতঃ॥"[৭]

২) দঃখের কারণ আছে—

সংসারে যেমন দুঃখ আছে তেমনি দুঃখের কারণ আছে। কারণ এই জগতে সকল

কার্য কারণাত্মক হয়। বুদ্ধদেবের মতে 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নীতি অনুসারে জাগতিক প্রতিটি ঘটনা কারণবশতঃ ঘটে। এভাবে বৌদ্ধদর্শনে দুঃখের কার্যকারণ শৃঙ্খলের মোট বারটি কারণ দেখা যায়। এইসব কারণগুলিকে 'দ্বাদশ নিদান' বা 'ভবচক্র' বলা হয়। সাংখ্যদর্শনকার কপিলমুনি এই কার্য যে কারণাত্মক সেই প্রসঙ্গে বলেছেন—

"অসদকারণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্॥"[৮]

৩) দুঃখ নিরোধ সম্ভব—

যে কারণের জন্য দুঃখের উদ্ভব হয়, সেই কারণ ধ্বংস হলে দুঃখের নিরোধ সম্ভব হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ আসক্তি হীন কোনো কর্ম করা, কারণ এতে বন্ধন হয় না। এই প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদে উক্ত আছে—

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥"[৯]

৪) দুঃখ নিরোধের উপায় আছে—

দুঃখ নিরোধের উপায়কে বৌদ্ধদর্শনে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা হয়। এই আটটি মার্গগুলি হল— (১) সম্যক দৃষ্টি (২) সম্যক সংকল্প (৩) সম্যক বাক্ (৪) সম্যক কর্মান্ত (৫) সম্যক আজীব (৬) সম্যক ব্যায়াম (৭) সম্যক স্মৃতি (৮) সম্যক সমাধি।

এই আটটি মার্গ যদি দুঃখকাতর ব্যক্তি অনুসরণ করে তাহলে তার জীবনে যতই দুঃখ আসুক না কেন তা সে নিরোধ করতে একাই পারবে। কারণ দুঃখ কোখনোও চিরস্থায়ী হয় না, তারপরেই সুখ আসে। তাইতো এই প্রসঙ্গে মহাভারতে উক্ত আছে-

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
পর্যায়েনোপনমন্তে নরং নেমিমরাইব॥"[১০]

বৌদ্ধদর্শনের এই যে 'চত্বারি আর্যসত্যানি'- কেবল মানবকে যে দুঃখ থেকে মুক্ত করে তা নয়, সমগ্র পরিবেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

ক্ষণভঙ্গবাদ—

বৌদ্ধদর্শনে ক্ষণভঙ্গবাদ বা অনিত্যবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদ থেকেই অনুসৃত। যা কিছু কারণ থেকে উদ্ভুত হয় সবই ঐ কারণে তিরোহিত হলে অপসৃত হয়ে যায়। তাই বুদ্ধদেবের মতে সবকিছুই অনিত্য এবং ধ্বংসশীল। আমাদের অন্তরে, বাইরে, গোচরে, অগোচরে যত কিছু, পদার্থ আছে সবই নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তনের ধারা বা প্রবাহটি একটি পরম্পরা। যেমন নদীর জলধারা এবং অগ্নিশিখা। নদীর জলধারা যেমন নিত্য পরিবর্তনশীল এবং অগ্নিশিখা নিয়তই চঞ্চল, তেমনি জাগতিক বস্তুসমূহ ও নিয়ত পরিবর্তনশীল ও চঞ্চল। এই পরিবর্তনশীল জীবন সম্পর্কে মহামতি চাণক্য বলেছেন—

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন – যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি॥"[১১]

অর্থাৎ, সৃষ্টিশীল সকল কিছুরই পরিণাম হল ধ্বংস। এমনকি আমাদের জীবন এবং পরিবেশও। তাই আমাদের বৌদ্ধদর্শন থেকে শিক্ষা নিয়ে এটা করা উচিত যে, ক্ষণস্থায়ী এই জীবন ও পরিবেশকে সুনির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে সকলে সকলের প্রতি অনুগত করার চেষ্টা করা। কারণ এর দ্বারাই মানবকুলও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

জৈন দার্শনিকগনের দৃষ্টিকোণে মানব ও পরিবেশ—

জৈনদর্শন বা অর্হত দর্শন হল ভারতীয় দর্শনে নাস্তিক শ্রেনীভুক্ত অন্যতম প্রাচীন দর্শন। এই দর্শন প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে আবির্ভাব ঘটে। জৈনধর্ম প্রচারের প্রথম তীর্থঙ্কর হলেন ঋষভদেব এবং অন্তিম তীর্থঙ্কর হলেন মহাবীর। এখন আমরা দেখব জৈনদর্শনে কোন কোন তত্ত্বগুলি মানব ও পরিবেশে প্রভাব ফেলেছে—

রত্নত্রয়ম্—

জৈন দার্শনিকগনের এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল— রত্নত্রয়ম্। এই "রত্নত্রয়ম্"-এর লক্ষ্যণ প্রসঙ্গে "তত্ত্বর্থসূত্রম্" —এ উল্লেখ আছে—

"সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ।"[১২]

১) সম্যক দর্শন—

জৈনরা অবশ্যই শ্রদ্ধা বলতে অন্ধভক্তিকে বলেননি। যুক্তি, তর্ক ও বিচার—এর বিশ্লেষণজাত শ্রদ্ধাই জৈনদের আদর্শ। তাঁদের মতে অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণই হল সম্যক দর্শন বা সম্যক শ্রদ্ধালাভের উপায়।

অতএব আমরা দেখলাম যে, যেখানে অন্ধবিশ্বাস টিকে রয়েছে সে পরিবেশ দূষিত হবে। আর এই অন্ধবিশ্বাসের মূলকারণ হল মানবকুল। যারা এই অন্ধবিশ্বাসকে জাগিয়ে রেখেছে। তাই প্রত্যেক মানবকুল সজাগ হয়ে সুন্দর পরিবেশ নির্মানের তৎপরতায় নিয়োজিত হতে হবে। তবেই পরিবেশের প্রাণীকুলের ভারসাম্য বোঝায় থাকবে।

২) সম্যক জ্ঞান—

জৈন দর্শনে সম্যক্ জ্ঞান বলতে জীব ও অজীবের সম্বন্ধে সংশয়, ভ্রম ও অনিশ্চয়তা দূরীকরণকে বোঝায়। এর দ্বারাই কর্মের প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়। কেবল জ্ঞান ও সর্বজ্ঞতা লাভই জীবনের চরম পুরুষার্থ।

তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ শুধুমাত্র নিজে জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানী হয়ে লাভ নেই, কারণ তা হল দানের বিষয়, এবং তা করলেই সুস্থ পরিবেশ গঠন করা সম্ভব। এই জ্ঞানের প্রসঙ্গে মহামতি চাণক্য বলেছেন—

"অপূর্বঃ কোঽপি ভাণ্ডারস্তব ভারতি দৃশ্যতে।
ব্যয়তো বৃদ্ধিমায়াতি ক্ষয়মায়াতি সঞ্চয়াৎ॥"[১৩]

৩) সম্যক চরিত্র—

কল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদন করা এবং অনিষ্টকারক কর্ম পরিহার করাই হল সম্যক চরিত্রের মূল কথা। সুতরাং যে ব্যক্তি কামনা, বাসনা, ইন্দ্রিয়, চিন্তা, বাক্য, প্রবৃত্তি ইত্যাদিকে সংযম করে, তখন তিনি-ই সম্যক চরিত্রবান রূপে বিবেচিত হন। জৈন দর্শনের এই তত্ত্ব থেকে আমরা শিখলাম যে, এই পরিবেশকে উন্নত করতে গেলে আগে নিজেকে উন্নত করতে হবে। তবেই পরিবেশের অস্তিত্ব থাকবে। নিজেকে উন্নতির প্রসঙ্গে গীতাতে উক্ত আছে—

"যতো যতো নিশ্চিরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যের বশং নয়েৎ॥"[১৪]

পঞ্চমহাব্রত—

জৈন দার্শনিকের এক উজ্বল মানবকল্যানকারী তত্ত্ব হল পঞ্চমহাব্রত। যেখানে মানবকুলকে বাঁচার ও বাঁচাবার তাগিদকে জাহির করে। সেই পঞ্চমহাব্রত হল

সর্বদর্শনসংগ্রহকারের মতে—

"অহিংসাসূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ।"[১৫]

১) অহিংসা—

গতিশীল ও গতিহীন সমস্ত প্রকার জীবের প্রতিহিংসা থেকে বিরত থাকাই হল অহিংসা। কারণ যে কোন জীবই যত সাধারণ বা নিকৃষ্ট শ্রেনীর হোক না কেন, অন্য জীবের মত সেও মহৎ এবং সম্ভাবনাময়। সুতরাং প্রত্যেক জীবই তার নিজের জীবনের মত অন্যের জীবনের মূল্যও নিশ্চয়ই স্বীকার করে। এই ধারনার উপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে অহিংসা ব্রত।

জৈনদার্শনিকদের তত্ত্ব নিয়ে আমাদের প্রত্যেক প্রানীকুলের মধ্যে তথা মানবকুলের মধ্যে হিংসাকে বিসর্জন দিয়ে অহিংসা পথ খুঁজে নেওয়া। কারণ হিংসাই ধ্বংসের মূলকারণ, অতএব "অহিংসা হি পরমো ধর্মঃ" হওয়া উচিৎ আমাদের। এই প্রসঙ্গে মহামতি মনু বলেছেন—

"নারুন্তুদঃ স্যাদার্তোঽপি ন হরদ্রোহকর্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েত্॥"[১৬]

২) সত্য—

প্রিয়, হিতকর ও যথার্থ বাক্য প্রয়োগেই সুনৃত বা সত্যব্রত। একজন গৃহী নিজে মিথ্যা কথা বলবে না, অন্যকে মিথ্যা কথা বলতে প্রেরণা দেবে না এবং অন্যের মিথ্যা কথাকে সমর্থন করবে না, তবেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

জৈনদর্শনের এই তত্ত্বথেকে আমরা শিখলাম যে, সত্যের চেয়ে বড়ো এই জগতে আর কিছু নেই। তাইতো মুন্ডকোপনিষদে উক্ত আছে—

"সত্যমেব জয়তে নানৃমতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥"[১৭]

এমনি কী এই সত্য প্রসঙ্গে সর্বদর্শনসংগ্রহে উল্লেখ আছে—

"প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সুনৃতং বৃতমুচ্যতে।"[১৮]

৩) অস্তেয়—

অন্যের দ্রব্য বিনানুমতিতে গ্রহণ না করাই হল অস্তেয় বা চৌর্য। কিংবা অপহৃত দ্রব্য জেনে ভোগ করা, দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কম ওজন ব্যবহার করাও চুরি করা। এসবকে জৈনদর্শন পরিত্যাগ করতে বলেছেন।

সুস্থ মানসিক ও সুস্থ পরিবেশ গঠনের জন্য আমাদেরকে এইরূপ মনোভাব ও অন্যায় কাজকে ত্যাগ করা উচিৎ।

৪) ব্রহ্মচর্য—

কাম নিবৃত্তিই হল ব্রহ্মচর্য। জৈনদর্শনে ব্রহ্মচর্য শব্দটি আরও ব্যপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেটি হল— সর্বপ্রকার কাম নিরোধই হল ব্রহ্মচর্য। এর দ্বারাই ইন্দ্রিয়াদি সংযম করা যায়।

নিজেকে উন্নত করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে ব্রহ্মচর্য বিদ্যা লাভ করা উচিৎ। কারণ এর দ্বারাই নিজেকে শক্তিশালী করা যায়। যোগদর্শনকার পতঞ্জলি ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গে বলেছেন—

"ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ।"[১৯]

৫) অপরিগ্রহ—

সকল প্রকার আসক্তি বা মোহ ত্যাগই হল অপরিগ্রহ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহকে নিজ নিজ বিষয় সমূহেতে আকর্ষণ থেকে মুক্ত করাই হল অপরিগ্রহ। জৈন দর্শনের এই তত্ত্বটি আমরা তথা মানবকুল পালন করলে বিষয়বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারে আর জীবের বন্ধনের কোন আশা থাকবে না। তাইতো গীতাতে উক্ত আছে—

"যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।"[২০]

সাংখ্যদার্শনিকগণের দৃষ্টিকোণে মানব ও পরিবেশ—

ভারতীয়দর্শন সমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম দর্শন হল সাংখ্যদর্শন। এই দর্শনের প্রবর্তক হলেন মহর্ষি কপিল মুনি। এটি হল একটি আস্তিক দর্শন। এখন আমরা দেখব, এই সাংখ্যদর্শন মানব ও পরিবেশে কতটা প্রভাব ফেলেছে—

ত্রিবিধ দুঃখ—

এই জগৎ সংসার হল দুঃখের আধার। মানুষের যেমন রোগ ও ব্যাধি নিত্য সঙ্গী, তেমনি দুঃখও মানুষের নিত্যসঙ্গী।এই দুঃখের প্রকারভেদ সম্পর্কে সাংখ্যকারিকায় উক্ত আছে—

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাহপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ।।"[২১]

এই ত্রিবিধ দঃখ হল— আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ শরীরকে অধিকার অর্থাৎ আশ্রয় করে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তা অধ্যাত্মিক দুঃখ নামে পরিচিত। যেমন— দৈহিক ও মানসিক দুঃখ।

ভূত অর্থাৎ ব্যাঘ্র-সরীসৃপাদি অন্য প্রানী হতে তথা বৃক্ষাদি স্থাবর বস্তু হতে উৎপন্ন দুঃখ হচ্ছে আধিভৌতিক দুঃখ। যক্ষ-রাক্ষসাদি দেবযোনি তথা ক্রুর গ্রহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি হতে যে দুঃখ জন্মে সেই দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা হয়। এই সাংখ্যদর্শনে কেবল দুঃখের কথাই বর্ণনা করা হয় নি। তার থেকে মুক্তির উপায়ও বলেছেন যথা- বৈদিক কার্যকলাপের দ্বারা মুক্তি সম্ভব।

অতএব আমরা দেখলাম যে, এই জগৎ সংসারে প্রত্যেকের দুঃখস্থির, তবুও তা থেকে মানব কেবলমাত্রই নিরাময় লাভ করতে পারে। তাইতো মানবকুলের কাছে এই সংসার তথা পরিবেশ গুড়জিহ্বিকান্যায়।

সৎকার্যবাদ—

সাংখ্যশাস্ত্র হল দ্বৈতবাদী দর্শন। এখানে পুরূষ ও প্রকৃতি নামক দুটি স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর নিত্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আমরা বলতেই পারি যে, এই প্রকৃতি হল আমাদের পরিবেশ এবং পুরুষ হল মানবকুল। এছাড়া এই সাংখ্যদর্শনে উক্ত কার্যকারণতত্ত্বটির নাম হল "সৎকার্যবাদ"। যে কোন কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে কারণের যে অস্তিত্ব থাকে কিনা সেটাই হলো মূলকথা। এখন আমরা দেখব যে, এই সৎকার্যবাদ মানব ও পরিবেশে কীভাবে প্রভাব ফেলেছে। সাংখ্যদর্শনে সৎ কার্যবাদটি হল—

শক্তস্য শক্যকারণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্।।"[২২]

১) অসদকারণাৎ—

অর্থাৎ যার অস্তিত্ব নেই, তার কখনও উৎপত্তি হয় না। যদি অসৎ থেকে কার্যের উৎপত্তি হতো তাহলে যে কোন জিনিস থেকে যা খুশি জিনিস তৈরী করা যেত। উপাদান কারণে কার্য যদি সত্যিই না থাকতো তবে কুম্ভকার শত চেষ্টা করেও মৃত্তিকা থেকে ঘট তৈরী করতে পারত না।

২) উপাদানগ্রহণাৎ—

নির্দিষ্ট বস্তু তৈরী করতে হলে নির্দিষ্ট উপাদান গ্রহণ করতে হয়। যেমন দধি প্রস্তুত করতে হলে উপাদান রূপে দুগ্ধকেই গ্রহণ করা হয়, জলাদিকে নয়।

৩) সর্বসম্ভবাভাবাৎ—

একই উপাদান থেকে সকল প্রকার বস্তুর উৎপত্তি হয় না। বস্তুতে যার সম্ভাবনা থাকে তা থেকেই সেই বস্তুর উদ্ভব হয়। যেমন তিল থেকেই তৈল উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ থেকেই ঘৃত উৎপন্ন হয়। তাই নৈয়ায়িকরা বলেছেন— তিলই তৈলের কারণ, বালুকা তৈলের কারণ নয়।

৪) শক্তস্য শক্যকরনাৎ—

"শক্ত"-শব্দের অর্থ হল শক্তিযুক্ত অর্থাৎ কার্যোৎপত্তির সামর্থবান। "শক্য"- মানে যা উৎপাদন যোগ্য। বীজে অঙ্কুর রূপ কার্যের শক্তি বা সামর্থ নিহিত থাকে বলে বীজের শক্য হল অঙ্কুর।

৫) কারণভাবাৎ—

কার্যটি কারণ স্বরূপ অর্থাৎ কারণ থেকে অভিন্ন। যেমন দুধ থেকে দই হয় বলে দই দুধ থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন। সাংখ্যদর্শনে "সৎকার্যবাদ"— অধ্যয়ন করে আমরা বুঝতে পারলাম যে— এই পরিবেশও প্রত্যেক বস্তুর উৎপত্তির পেছনে নির্দিষ্ট কারণ তথা শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে ঘটে না। তাই বলা যায় যে, এই মানব ও পরিবেশের উৎপত্তির নির্দিষ্ট কোনো না কোনো কারণ রয়েছে।

পুরুষের অস্তিত্ব—

সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাব্ধি যে পুরুষের তথা মানুষের অস্তিত্ব আছে, সেই প্রসঙ্গে সাংখ্যকারিকায় উক্ত আছে—

"সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াদধিষ্টানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥"[২৩]

১) সংঘাত—

যারা সম্মিলিতভাবে অর্থাৎ পরস্পর মিলিত হয়ে কার্য করে তারা হল সংঘাত। এইসব সংঘাত বস্তু অপরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। যেমন— ঘট, পটাদি সাবয়ব বস্তু নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। এগুলো কোন চেতনা ভোক্তা পুরুষের ভাগ্যে বিষয়রূপে ব্যবহৃত হয়।

২) ত্রিগুণদিবিপর্যয়াৎ—

পুরুষ হল ত্রিগুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ থেকে অন্যাবস্থা, তাই তো পুরুষের সিদ্ধি ঘটে।

৩) অধিষ্ঠানাৎ—

দেখা যায় যে জড়বস্তু কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বা সান্নিধ্য ব্যতীত কাজ করতে

পারে না। তাই মহদাদি জড়বস্তুসমূহের অধিষ্ঠাতারূপে চেতন পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

৪) ভোক্তৃভাবাৎ—

অন্নব্যঞ্জনাদি নানাবিধ বস্তু দেখে বোঝা যায় যে, এদের একজন ভোক্তা আছে। আর সেই ভোক্তা হল একমাত্র চেতনযুক্ত পুরুষ।

৫) কৈবল্যার্থং প্রবত্তেশ্চ—

কৈবল্য মানে হল আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। অর্থাৎ জীবের কৈবল্যের জন্য প্রবত্তি থেকেও পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

"পুরুষের অস্তিত্ব"—সাংখ্যদর্শনের এই তত্ত্বটি অধ্যয়ন করে আমরা জানলাম যে আমাদের অর্থাৎ এই পরিবেশে মানবকুলের উৎপত্তির পেছনে একটি মহদ্ উদ্দেশ্য রয়েছে। তাই আমাদের বৃথা সময় ব্যায় না করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কার্যে মনোনিবেশ করা উচিৎ।

পুরুষবহুত্ব—

সাংখ্যদর্শনের এক অন্যতম তত্ত্ব হল "পুরুষবহুত্ব"। সাংখ্যদর্শনে বহুপুরুষবাদ স্বীকৃত। পুরুষ এক নয়, বহু। দেহভেদে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন, তাই পুরুষ অনেক। "পুরুষবহুত্ব" এই বিষয়ক সংখ্যকারিকায় উক্ত কারিকাটি হল—

"জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ অযুপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্ব সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য বিপর্যয়াচ্চৈব॥"[২৪]

১) জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ—

বিভিন্ন ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু ও করণাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার একই সঙ্গে হয় না, পৃথক পৃথক ভাবেই হয়। একজনের জন্মে সকলের জন্ম, বা একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু হয় না অথবা একের অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয় বৈকল্যে সকলের অন্ধত্বাদি সিদ্ধ হয় না। সুতরাং স্বীকার করতে হয় পুরুষ এক নয়, বহু।

২) অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ—

অর্থাৎ সমস্ত জীবের প্রবৃত্তি একসংগে বা যুগপৎ হয় না। প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি দেখা যায়। সুতরাং "পুরুষ বহুত্ব" সিদ্ধ হয়।

৩) ত্রৈগুণ্যবিপর্যায়াৎ—

অর্থাৎ শরীর ভেদে সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ —এই তিনটি গুণের আনুপাতিক তারতম্য দেখা যায়। প্রাণীজগতে কেউ সত্ত্বপ্রধান, কেউ রজঃ আবার কেউ বা তমঃ প্রধান। সুতরাং পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করতে হয়। অতএব আমরা দেখলাম যে, আমরা মানবরা কেউ একইসঙ্গে জন্মাতে পারি না, আবার কারোর সমান সমান প্রবৃত্তি থাকতে পারে না। তাই তো মানবের এত ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় এই পরিবেশে।

যোগদার্শনিকগণের দৃষ্টিকোণে মানব পরিবেশ—

যোগদর্শনের প্রবক্তা হলেন মহর্ষি পতঞ্জলি। মহর্ষি পতঞ্জলির "যোগসূত্র"- যোগদর্শনের আদি ও মূলগ্রন্থ। এই যোগদর্শন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাইতো যোগদর্শন হল ভারতীয়দর্শনের ব্যবহারিক দিক। এমনকি এই যোগের দ্বারাই পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করা যায়। এখন আমরা দেখব যে, যোগদর্শনের কোন কোন তত্ত্বগুলি মানব ও পরিবেশে প্রভাব

ফেলেছে—

পঞ্চক্লেশ—

জগৎসৃষ্টি হওয়ার পরে পরেই এই সংসারে ক্লেশের আবির্ভাব ঘটে। যদিও এর আগে আমরা সাংখ্যদর্শনে ত্রিবিধ দুঃখের কথা পাই, তার তেকে ভিন্ন হল এই পঞ্চক্লেশ। সেগুলি হল- যোগ দর্শনের ভাষায়—

"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ।"[২৫]

১) অবিদ্যা—

মনুষ্য শরীর হাড়-মাংস-মজ্জা-অস্তি ইত্যাদি অপবিত্র ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত। একই ধাতুর তৈরি স্ত্রী-পুরুষের শরীরকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অপবিত্র অশুচি জেনেও মানুষ আপন শরীরে পবিত্রতার অভিমান করে এবং স্ত্রী-পুত্র-স্বামী প্রভৃতির শরীরকে ভালোবাসে। এই হল অপবিত্রে পবিত্রের অনুভূতিরূপ অবিদ্যা। এই অবিদ্যার স্বরূপপ্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

"অনিত্যাশুচি দুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।"[২৬]

অর্থাৎ, আমরা দেখলাম যে, অবিদ্যার দ্বারা যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তা কেবলমাত্র মানবের না।এই পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাবস্বরূপ। এই অবিদ্যার ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে ঈশোপনিষদে উক্ত আছে—

"বিদ্যা চাবিদ্যাং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥"[২৭]

২) অস্মিতা—

দৃক্শক্তি ও দর্শনশক্তি বা বুদ্ধিশক্তির একতানই হল অস্মিতা বা অহংকার। এই অহংকার উৎপন্ন হয় অজ্ঞান থেকে। এর দ্বারাই মানবকুল নিজেকে কর্তা মনে করে এই জগতের। এই অস্মিতার স্বরূপ প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

"দৃগদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাঽস্মিতা।"[২৮]

আমাদের জীবনে সুখ পেতে গেলে আগে দুঃখকে পরিহার করতে হবে। কারণ দুঃখের দ্বারাই সবকিছুরই বিনাশ ঘটে। তাই আমাদের প্রত্যেক মানবকুলকে এই পরিবেশ থেকে দুঃখ মুক্তির জন্য এই অস্মিতা বা অহংকার ত্যাগ করতে হবে। তবেই পরিবেশের ভারসাম্য থাকবে। এই অহংকারের প্রসঙ্গে গীতায় উক্ত আছে—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়ামানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্ত্তাঽমিতি মন্যতে॥"[২৯]

৩) রাগ—

পঞ্চক্লেশের মধ্যে অন্যতম হল রাগ। প্রকৃতিস্থ জীবের যখন কোনো অনুকূল পদার্থের সুখের প্রতীতি হয় তখন তাতে এবং তার নিমিত্তসমূহেও তার আসক্তি জন্মায় একেই "রাগ" বলা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি রাগের স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন—

"সুখানুশয়ী রাগঃ।"[৩০]

আমরা দেখলাম যে, রাগ হল সুখের প্রতীতির সঙ্গী, কিন্তু এই রাগও আমাদের দুঃখের মূল কারণ। কারণ এই রাগ উৎপন্ন হয় আসক্তি থেকে। তাই আমাদের প্রত্যেককেই রাগ ত্যাগ করা উচিৎ। রাগ বা কোপের ক্ষতিকর প্রভাব প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রকার কৌটল্য বলেছেন—

"কোপাজ্জনমেজয়ো ব্রাহ্মণেষু বিক্রান্তঃ।"[৩১]

৪) দ্বেষ—

পঞ্চক্লেশের মধ্যে চতুর্থ ক্লেশ হল দ্বেষ। মানবের যখন কোনো প্রতিকুল পদার্থে দুঃখের প্রতীতি হয় তখন, সেই পদার্থের এবং তার নিমিত্তের প্রতি দ্বেষ জন্ম নেয়। এই দ্বেষের লক্ষণে মহর্ষি পঞ্জলি বলেছেন—

"দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।"[৩২]

আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ কোনো কিছু চাওয়ার পেছনে যদি দুঃখ থেকেও থাকে, তবে কারোর প্রতি দ্বেষ বা হিংসা কার উচিৎ নয়। তাইতো গীতায় উক্ত আছে—

"অদ্বেষ্টাসর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥"[৩৩]

৫) অভিনিবেশ—

পঞ্চক্লেশের মধ্যে অন্তিম ক্লেশ হল অভিনিবেশ। পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জিত সংস্কার বয়ে নিয়ে আসায় বিদ্বান ও অবিদ্বান দুজনেরই প্রসিদ্ধ যে ক্লেশ জন্মায়, তা হল অভিনিবেশ বা মরণভয়। তাই তো কোনো জীব প্রাণের বিয়োগ চায় না, বেঁচে থাকতে চায়, আপন অস্তিত্ব বোঝায় রাখতে চায়। এই অভিনিবেশের স্বরূপে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

"স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারুঢ়োঽভিনিবেশঃ॥"[৩৪]

আমরা দেখলাম যে, মানব তথা প্রানীকুল যত দিন নিজের প্রাণের প্রতি মায়া না ত্যাগ করতে পারছে ততদিনই তার জীবনে শান্তি আসবে না। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ মায়া মোহ এই জীবনকে ত্যাগ করে সকলের উৎসর্গে নিবেদন করা উচিৎ। কারণ এ জগতে চিরন্তন সত্য হল মৃত্যু। তাই তো গীতাতে উক্ত আছে—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"[৩৫]

অষ্টাঙ্গ যোগ—

যোগদর্শনের এক মহস্তত্ত্ব হল এই অষ্টাঙ্গ যোগ। কারণ এর দ্বারাই শুধুমাত্র মানবকল্যানই নয় এই জগৎ সংসার তথা পরিবেশ সুরক্ষিত রাখা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে এই অষ্টাঙ্গ যোগ হল—

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ঽষ্টাবঙ্গানি।"[৩৬]

১) যম—

অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে প্রথম যোগ হল যম। এই যমরূপ যোগ যদি মানবকুল উপাষনা করে তাহলে সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে পারবে। মহর্ষি পতঞ্জলি যমের স্বরূপে বলেছেন—

"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ॥"[৩৭]

অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে, যদি কোনো মানব শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে উন্নত হতে চায়, তাহলে তাকে প্রথম যমের উপাষনা করতে হবে। কারণ যম বলতে বোঝায় সংযম। যা অনিষ্টাদি থেকে বিরত করতে শেখায়। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে—

"অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।"[৩৮]

২) নিয়ম—

যোগদর্শনের অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে দ্বিতীয় যোগ হল নিয়ম। সেখানে পরিষ্কার, সন্তুষ্টি, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরের শরণাগতির কথা বলা হয়েছে। মহর্ষি পতঞ্জলি নিয়মের স্বরূপে বলেছেন—

"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।"

আমরা দেখলাম যে, এই জগৎ সংসার তথা মানবকুল নিয়মের দাস যেমন সাহিত্য হল সাহিত্যিকের রচনাক্ষেত্র। তাই সেইসব নিয়মকে যে ব্যক্তি যথাযথভাবে পালন করে সেই-ই নতুন পথের সন্ধান পায় এবং সেই-ই এই পরিবেশের সমস্ত কিছুরই অধিকারী হয়। এই অধিকারীর স্বরূপে বেদান্তসারে উক্ত আছে—

"অধিকারী তু বিধিবৎ অধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততঃ অধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য নিষিদ্ধবর্জনপুরঃ-সরং নিত্য নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।"[৩৯]

৩) আসন—

যোগদর্শননের অন্যতম যোগঙ্গ হল আসন। যার মাধ্যমে মানব এই সংসারে তথা নিজের মধ্যে যে সব চঞ্চল ইন্দ্রিয় রয়েছে সেগুলো খুব সহজেই সংযম করতে পারে। আসনের স্বরূপে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

"স্থিরসুখমাসনম্।"৪০

অর্থাৎ, আমরা দেখলাম যে চঞ্চল এই জগৎ তথা ইন্দ্রিয় সংযমের উপায় হল এই আসন। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিৎ সুমানসিক এবং সুশরীর পাওয়ার জন্য আসন করা। তাইতো গীতাতে ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে উক্ত আছে—

"প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীৎ মৎপরঃ॥"[৪১]

৪) প্রাণায়াম—

শরীরে প্রাণবায়ুর প্রবিষ্ট ও বাইরে নির্গত হওয়া এই দুই-এর গতিকে রুদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রাণায়াম। এই প্রাণায়মের লক্ষ্যণে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

"তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।"[৪২]

যদি প্রত্যেক মানবকুল এই প্রাণায়াম করে তাহলে তারা কার্য উদ্যোম, অস্থিরতা ত্যাগ এমনকি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। যা পরিবেশের পক্ষে খুব প্রয়োজন।

৫) প্রত্যাহার—

ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজেদের বিষয়ের প্রতি অকৃষ্ট রহিত করে সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে চিত্তের সমানতাই নিয়ে আসাকে বলা হয় প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহারের লক্ষ্যণ হল—

"স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহারঃ।"[৪৩]

অর্থাৎ মানবকুলকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে ইন্দ্রিয়গুলির সংযম হল জীবনের এক বড় সাধনা। যার সাধনার ব্রতী ছিল মানবকুল, তার ফল হল সুন্দর পরিবেশ। এই প্রসঙ্গে কঠোপনিষদে উক্ত আছে—

"যচ্ছেদ্বাত্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যথেচ্ছজ্জ্ঞান আত্মনি।"
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥"[৪৪]

৬) ধারণা—

চিওকে শরীরের ভেতরে নাভি ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে বা বাইরের বিষয়রূপ দেশে স্থিরতা করাকে ধারণা বলা হয়। ধারণার স্বরূপে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

"দেশবন্ধচিত্তস্য ধারণা।"[৪৫]

অর্থাৎ সকল প্রাণীর সবচেয়ে চঞ্চল ইন্দ্রিয় হল চিত্ত। তাই যে ব্যক্তি এই চিত্তকে নিজের কাজের দাস করে রাখতে পারে, সে জীবনে সকল কাজে সাফল্য পাবেই পাবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ এই মনকে লাগাম দেওয়া। এই প্রসঙ্গে শিবসংকল্পসুক্তে উক্ত আছে যে—

"সুসারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্ নেনীয়তেঽভীশুভিবার্জিন ইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যজ্জিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥"[৪৬]

৭) ধ্যান—

যে নির্দিষ্ট বস্তুতে চিত্ত নিবিষ্ট করা হয়, তাকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি বৃত্তির নিরন্তর প্রবাহ ঘটে, মাঝখানে অন্য কোনো বৃত্তির আবির্ভাব ঘটে না, সেটাই হল ধ্যান। মহর্ষি পতঞ্জলি ধ্যাণের স্বরূপে বলেছেন—

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"[৪৭]

অর্থাৎ আমাদের মানবকুলকে এমনভাবে হতে হবে যে যেখানে চিত্তের একাগ্রতা এমনভাবে আসবে যাতে কোন বাধা, বাধা হতে না পারে, তবেই মানবের সিদ্ধি নিশ্চিত। এই সাধন বিষয়ে গীতাতে উক্ত আছে—

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রানাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥"[৪৮]

৮) সমাধি—

গভীর ধ্যানে মগ্ন হলে চিত্ত যখন ধ্যেয়েতে একাকার হয়ে যায়, তখন তার আপণ স্বরূপের যেন অস্তিত্ব থাকে না, ধ্যান করছি এই বোধ ও থাকে না, ধ্যেয়েতেই চিত্ত একাকার হওয়াকে সমাধি বলা হয়। যোগদর্শনে সমাধির স্বরূপ হল—

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।"[৪৯]

অর্থাৎ, আমরা দেখলাম যে, মানব জন্মের একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে। তাই জীবনটাকে বৃথা ব্যয় না করে নিজের ও সকলের তথা পরিবেশের মঙ্গলের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া। এবং তাঁর মধ্যে যিনি একই ভূতে সর্ব আত্মার দর্শন পান তিনিই সমাধি বা নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন। তাই গীতাতে উক্ত আছে—

"যোহন্তঃ সুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥"[৫০]

উপসংহার—

আমরা প্রায় প্রত্যেকটি দর্শনে লক্ষ্য করলাম যে, মানব ও পরিবেশের প্রসঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শুধুমাত্র যে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতে নয়, ভারতীয় দার্শনিকগণরাও সেই মানব ও পরিবেশের প্রেমে আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মৃত্তিকা ব্যতীত ঘটের যেমন অস্তিত্ব নেই, তেমনি পরিবেশ ব্যতীত মানব কুল আশ্রয়হীন। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ এই পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখতে মানবের মধ্যে সৌহার্দিকবোধ স্থাপন

করতে হবে। তবেই মানব ও পরিবেশের ভারসাম্য টিকে থাকবে। কারণ এই পরিবেশ তথা জগতের উৎপত্তির প্রসঙ্গে সমস্ত দার্শনিকগণ আজও গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিতমান। তাই তো মনুসংহিতায় উক্ত আছে—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্কমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥"[৫১]

আর এই দর্শন হল অধ্যাত্মিক চিন্তা, ভাবনা তথা যুক্তিপূর্ণ বাক্যের প্রকাশ, যা মানবকুলকে এক নবমার্গের সন্ধান দেয়। তাই আমরা বলতে পারি যে, দর্শন, মানব ও পরিবেশ —এই তিনটি হল একটি মহৎ কার্যের সহায়ক উপকরণস্বরূপ, যার একটি ব্যতীত হলে সেই মহৎকার্যের উদ্দেশ্যে ব্যাহত হয়। তাই আমরা সকলে ধন্য যিনি আমাদের জন্য এই সুন্দর পরিবেশ তথা জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তাই তো আমরা সমবেত হয়ে সকলে বলব—

"চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন-কাঞ্চন-হার
কত চন্দ্র কত সূর্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধনধান্যময়, হায়, পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার
হে মহেশ, অগণনলোক গায় ধন্য ধন্য এ গীতি অনিবার॥"[৫২]

Endnotes

১. "গীতাঞ্জলি" - পৃষ্ঠা সংখ্যা-২
২. মনুসংহিতা ২/২০
৩. "বিষ্ণুপুরাণ"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২০
৪. "ভারতীয় দর্শন পরিচয়"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৬
৫. "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪
৬. "মহাভারতম্ বনপর্ব (২৬৭ অধ্যায়)"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৯
৭. "মনুসংহিতা সপ্তমোহধ্যায়ঃ"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৫
৮. "সাংখ্যকারিকা"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭
৯. "উপনিষদ"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩
১০. "স্বপ্নবাসবদত্তম্"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৭
১১. "চাণক্যনীতি"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৩
১২. "সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৮
১৩. "চানক্য নীতি"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫
১৪. "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৯৭
১৫. "সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১০
১৬. "মনুসংহিতা দ্বিতীয়োহধ্যায়"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২০
১৭. "উপনিষদসমগ্রহ"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৫৬
১৮. "সবদর্শন সংগ্রহ"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১০
১৯. "যোগদর্শন"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭০
২০ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৮
২১. "সাংখ্যকারিকা"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-১

২২. “সাংখ্যকারিকা”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৭
২৩. "সাংখ্যকারিকা"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৪
২৪. "সাংখ্যকারিকা"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৭
২৫. "যোগদর্শন"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৮
২৬. "যোগদর্শন"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫০
২৭. "উপনিষদ"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১
২৮. "যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১
২৯. "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৪
৩০. "যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১
৩১. “অর্থশাস্ত্রম্”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৪
৩২. "যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫১
৩৩. “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৯৩
৩৪. "যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৫২
৩৫. “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪১
৩৬. "যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৫
৩৭. "যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৫
৩৮. "উপনিষদ সমগ্র”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২৯
৩৯. “বেদান্তসারঃ”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৫
৪০. “যোগদর্শন”- পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৩
৪১. “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা”- পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮৫
৪২. “যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৫
৪৩. “যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৭৮
৪৪. “উপনিষদ”- “পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০২
৪৫. “যোগদর্শন”- পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮০
৪৬. "উপকার সংস্কৃত”- “পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৮
৪৭. "যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮০
৪৮. "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"- পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৮
৪৯. "যোগদর্শন”-পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮১
৫০. “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা”- পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৮
৫১. “মনুসংহিতা প্রথমোহধ্যায়ঃ"-পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০
৫২. "শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত”- পৃষ্ঠা সংখ্যা-২১৫

Bibliography

- মহর্ষি বেদব্যাস, *"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"*, সম্পা. সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা: সাহিত্য তীর্থ, ২০১৪।
- মহর্ষি বেদব্যাস, *"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"*, সম্পা. জয়দয়াল গোয়েন্দকা, গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস, ২০১৬।
- মহর্ষি বেদব্যাস, *"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"*, গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস, ২০১৪.
- মহর্ষি ব্যাসদেব, *"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (যথার্থ)"*, সম্পা. স্বামী শ্রী অড়গড়ানন্দজী, শ্রী পরমহংস স্বামী অড়গড়ানন্দজী আশ্রম ট্রাস', মুম্বাই, ২০১৯।
- মহর্ষি বেদব্যাস, “শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা”, সম্পা. স্বামী রমসুখদাস, গোরক্ষপুর; গীতাপ্রেস, ২০১৯।
- মহামতি চাণক্য, *“চাণক্য নীতি"*, সম্পা. তীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা: সাহিত্য তীর্থ,

২০১৪।

- মহামতি কৌটিল্য, *"অর্থশাস্ত্রম্"*, সম্পা. অধ্যাপক শ্রী যদুপতি ত্রপাঠী ও জনেশরঞ্জন ভট্টাচার্য, কলকাতা: বি.এন পাবলিকেশন, ২০১৭।
- মহর্ষি পতঞ্জলি, *"যোগদর্শন"*, "গীতাপ্রেস", গোরক্ষপুর, ২০১৭।
- মহর্ষি পতঞ্জলি, *"পাতঞ্জল যোগদর্শন"*, কলকাতা: রামকৃষ্ণ মঠ, ২০১২।
- মহাকবি ভাস, *"স্বপ্নবাসবদত্তম্"*, সম্পা. অধ্যাপক শ্রীযদুপতিত্রিপাঠী, কলকাতা: বি. এন. পাবলিকেশন, ২০১৬।
- *"উপনিষদ সমগ্র"*, সম্পা. কালিকানন্দ অবধূত, কলকাতা: গিরিজা, ২০১৫।
- *"উপনিষদ"*, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৪।
- কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *"গীতাঞ্জলী"*, বোলপুর: শান্তিনিকেতন গ্রন্থনবিভাগ, ১৯১০।
- ডাঃ মিথিলেস পাণ্ডে, *" উপকার সংস্কৃত"*, আগরা: উপকার প্রকাশন, ২০১৭।
- মহর্ষি বেদব্যাস, *"মহাভারতম্ বনপর্ব (২৬৭ অধ্যায়)"*, সম্পা. অধ্যাপক শ্রী যদুপতি ত্রিপাঠী, কলকাতা: বি.এন পাবলিকেশন্, ২০১৬।
- *"শ্রী বিষ্ণুপুরাণ"*, গীতাপ্রেস", গোরক্ষপুর, ২০১৭।
- *"ভারতীয় দর্শন পরিচয়"*, সম্পা. শ্রী যদুপতি ত্রপাঠী, কলকাতা: বি.এন পাবলিকেশন্, ২০১৫।
- মহামতি মনু *"মনুসংহিতা" (সপ্তমোহধ্যায়ঃ)*, অধ্যাপক অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬।
- মহামতি মনু, *"মনুসংহিতা" দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ*, সম্পা. অধ্যাপক অন্নদাশঙ্কর, পাহাড়ী, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২।
- মহামতি মনু, *"মনুসংহিতা "প্রথমোহধ্যায়ঃ*, সম্পা. শ্রী সুনীল কুমার জানা, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬।
- মহর্ষি কপিল মুনি, *"সাংখ্যকারিকা"*, সম্পা. অধ্যাপক বিপদভঞ্জন পাল, কলকাতা: সদেশ, ১৪১৭।
- মাধবাচার্য, "*সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন"*, সম্পা. সঞ্জিত কুমার সাধু খাঁ, কলকাতা: সদেশ, ২০১৬।
- শ্রী শ্রী যোগিন্দ্রমুনি, *"বেদান্তসারঃ"*, সম্পা. বিপদভঞ্জন পাল, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৫।

——